আমার এস এস সি রেজাল্ট

আমি ভালুকা উপজেলার বাটাজোর বি এম হাই স্কুল থেকে ১৯৭৭ সনে এস এস সি পাস করেছি। এই পরীক্ষার রেজাল্ট সংগ্রহ নিয়ে যে কাহিনী হয়েছিল তা আজ আমি লিখব। এস এস সি রেজাল্ট বের হবার ঘোষনা রেডিওতে দিয়েছে তিন দিন হয়। ডাকযোগে স্কুলে রেজাল্ট পৌছতে সময় লাগার কথা দুই দিন কিন্তু তিন দিন হয়ে গেল কিছুই জানতে পারলাম না। চিন্তায় পরে গেলাম। চতুর্থ দিন বাড়ী থেকে বের হলাম। বলে গেলাম কচুয়া যাচ্ছি। কচুয়া বাজারে একটি খোলা খালি ঘরে বেঞ্চে আমি, ফজলুল হক (ফজলু), দেলোয়ার হোসেন ও কিসমত বসে কিভাবে এস এস সি পরীক্ষার ফল পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলাপ করলাম। কেউ একজন বলল যে করটিয়া একটি ক্লাব ঘরে পাচ টাকা করে নিয়ে রেজাল্ট দিচ্ছে। আমরা চারজন রওনা দিলাম করটিয়ার উদ্দেশ্যে।

একটু এদেরকে পরিচয় করিয়ে দেই। ফজলু এখন নামকরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েট থেকে বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা। ঢাকায় থাকে। দেলোয়ারও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন যুব উন্নয়নের ডেপুটি ডাইরেক্টর। ডাকায় থাকে। কিসমত কি যেন পাস করার পর দেশের বাইরে চলে যায়। তার খোজ রাখতে পারি নি। আমরা সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কচুয়া পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই। ফজলু দেলোয়ারের চাচাত ভাই। কিসমত বয়সে বড়, ওদের চাচা হয়। তাই আমিও চাচা ডাকি। আপনি বলি। সেভেনে উঠার সময় ফজলু ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড, লুতফর থার্ড, মোসলেম ফোর্থ, দেলোয়ার ফিফথ ও কিসমত সিক্সথ হয়। লুতফর এখন পি এইচ ডি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির নাটক বিভাগের প্রফেসর। মোসলেম এস এস সি পাস করে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল।

সেভেনে উঠে ভাল ভাল ছাত্ররা এলাকার সবচেয়ে ভাল স্কুল বাটাজোর বি এম হাই স্কুলে চলে যায়। এতে ছিল ফজলু, দেলোয়ার, কিসমত সহ আরও অনেকে। আমি এই কচুয়া স্কুলেই থেকে যাই। প্রতিযোগী ভাল না থাকার জন্য আমি আস্তে আস্তে নিম্ন মানের হতে থাকি। তাছাড়া একমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষক নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আমি নিরুপায় হয়ে ১৯৭৫ সনে এপ্রিল মাসে বাটাজোর চলে যাই। এত দিন বিজ্ঞান ক্লাশ করতে না পারায় আমি নবম শ্রেণীর প্রথম সাময়িক পরিক্ষায় ফিজিক্স এ খারাপ করি। আমার মাথায় জ্জেদ চেপে যায়। উন্নতি হতে হতে প্রিটেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট বয় ফজলু থেকে মাত্র দুই নাম্বার কম পাই। টেস্ট পরীক্ষায় তার থেকে দুই নাম্বার বেশী পেয়ে আমি ফার্স্ট হই। তার মানে হল আমিই বাটাজোর স্কুলের এখন ফার্স্ট বয়।

আমরা রেজাল্ট আনার উদ্দেশ্যে কচুয়া থেকে পশ্চিম দিকে পাহাড়ি পথে হাটা শুরু করলাম। খুব সম্ভব জুলাই মাস। ১৯৭৭ সন। শালগ্রামপুর গিয়ে ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করলাম। নোকায় বসে কার রেজাল্ট কেমন হতে পারে তা নিয়ে কথা বললাম। আমি বললাম যে আমার ফার্স্ট ডিভিশন ছয়টি লেটার থাকতে পারে। ফজলুও তাই বলল। দেলোয়ার বলল যে তার দুই তিনটিতে লেটার থাকতে পারে। কিসমত চাচা বললেন যে তার রেজাল্ট আমার মতই হতে পারে। কারন, তিনি আমার পিছনেই সিট পেয়েছিলেন পরীক্ষার হলে।

আকাবাকা খাল, বিস্তির্ন বিল পারি দিয়ে বেলা ডোবার আগ দিয়ে করটিকা পৌছলাম। জমিদার বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটি ক্লাব ঘর থেকে কাগজের টুকরায় রুল নাম্বার লিখে বেড়ার ছিদ্র দিয়ে ভিতরে দিলে ভিতর থেকে রেজাল্ট লিখে দেয়া হয়। সময় নেই। বেলা ডোবার পর বন্ধ করে দেয়া হবে।

ফজলু আগে স্লিপ ঢুকালো। রেজাল্ট দেখে কাপতে কাপতে অজ্ঞান হয়ে পরে গেল। আমরা ধরাধরি করে ইদারা কুয়ার পারে নিয়ে বালতি দিয়ে পানি তুলে তার মাথায় দিতে লাগলাম। আমরা গ্রামে থেকে এভাবেই অজ্ঞান রুগী চিকিৎসা করতাম। আমি পানি তুলি দেলোয়ার পানি ঢালে। কিসমতও রেজাল্ট পেয়ে কাপ্তে কাপ্তে অজ্ঞান হয়ে পরে গেল। একি রেজাল্টএর মড়ক লাগলো নাকি! এখন রইলাম আমি আর দেলোয়ার। দুইজনকে দুইজনে পানি ঢালি। ক্লাব ঘর থেকে আওয়াজ আসছে আরো কেউ আছে নাকি, বন্ধ করে দিলাম। দেলোয়ার বলে তুমি যাও আগে, আমি বলি তুমি যাও আগে। দেলোয়ার আগে গেল, কিন্তু অজ্ঞান হল না। আমি রেজাল্ট পেয়ে অজ্ঞান হলাম না। আমি পেয়েছি ফার্স্ট ডিভিশন চার লেটার, দেলোয়ার পেয়েছে দুই লেটার। এবার ফজলুর স্লিপ দেখলাম। সে পেয়েছে দুই লেটার। কিসমত চাচাকে বললাম "চাচা, এত ভেংগে পড়লে চলবে? সবাই কি লেটার পায়? কত মানুষ যে ফেল করে?" চাচা বললেন "আমি ফেল করেছি গো। হু হু হু "।
আমি ফজলুকে, দেলোয়ার কিসমত চাচাকে ধরে নিয়ে মেইন রোডের দিকে হাটলাম। কচুয়ার সিনিয়র ফজলু ভাইর সাথে দেখা হল। তিনি ওখানে সাদত কলেজে অনার্স পড়েন। কি হয়েছে জানতে চাইলে বিস্তারিত বললাম। আমরা

চলে যেতে চাইলাম। তিনি জোড় করে তার হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। ওখানেই থাকলাম। তিনি আমাকে বিশেষ যত্ন নিলেন। এখন তিনি হাই স্কুলের শিক্ষক। ফোনে আমার খোজ খবর নেন। আমিও নেই।

সকালে নাস্তা করে নৌকা ভাড়া করে শাল গ্রামপুর পৌছলাম। মুশলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। থামার লক্ষণ নাই। চারজন বন্ধু ভিজে ভিজে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। ১০/১২ কিলোমিটার পায়ের পিছলা পথ। দৌড় দিলাম। এক দৌড়ে বাড়ী পৌছলাম। বাড়ী পৌছলে বৃষ্টি আরও জোরে নামল। গত কাল বাড়ীতে জানিয়ে যাই নি। মা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন।
-কই গেছিলি বাজান? কইয়া জাস নি কেন?
- রেজাল্ট আনতে গেছিলাম।
- আনছ?
- আনছি। ফার্স্ট ডিভিশন চারটি লেটার পাইছি।
- কই? দেও।
- পরে দিব। শুক্না জামা পরে নেই।
মা আচল দিয়ে আমার শরীর মুছে দিলেন।
পরেরদিন মহা খুশীতে রওনা দিলাম বাটাজোর গিয়ে সব স্যারের সাথে দেখা করতে। রাস্তায় যাকে দেখি তাকেই সালাম দেই। সালাম দিলেই জিগায় " সাদেক, কি খবর?" আমি বলি " ফার্স্ট ডিভিশন চারটা লেটার"।

স্যারগন আমাকে দেখে মহা খুশী। কোন এক স্যার বললেন " বেটা, আমাদের স্কুলে রেকর্ড ভেংগেছিস। " আমি টেস্টিমোনিয়াল হাতে পেয়ে বললাম " স্যার, মুল সার্টিফিকেট কবে পাব?"
- ওটা বোর্ড থেকে এক দেড় বছর পর স্কুলে পাঠাবে। এসে নিয়ে যাবে।
- যদি এর আগে দরকার পরে?
- তখন দরখাস্ত করে উঠান যাবে।
পাস করলাম আজ। সার্টিফিকেট দিবে দেড় বছর পর!
বাড়ী এসে একটা সাদা কাগজে দরখাস্ত লিখলাম ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে যে বিশেষ কারনে আমার এস এস সি সার্টিফিকেট জরুরী প্রয়োজন। দুই আনা দিয়ে খাম কিনে ডাকে দরখাস্ত পাঠালাম।

সাতদিন পর ডাকে একটি চিঠি আসল। লিখা " আপনার মুল সার্টিফিকেট ডাক যোগে স্কুল বরাবরে পাঠানো হয়েছে। আপনি উহা সংগ্রহ করুন - পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক "

আমি চলে গেলাম স্কুলে। সব স্যার একটি চিঠি দেখছে। লিখা আছে " সাদেকুল ইসলাম তালুকদারের মুল সার্টিফিকেট পাঠানো হল। উহা জরুরী সরবরাহ করুন - পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক "।

সবাই উতসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বিস্তারিত জানালাম।
- তুমি এমন করেছে কেন?
- আমার ইচ্ছা হল, স্যার।
দেখলাম সার্টিফিকেটটা একটা শক্ত খামে অতি যত্নসহকারে ভরা হয়েছে। ভাজ হয় নি। আমি ওটা নিয়ে বাড়ি এসে মাকে দেখালাম। বললাম "এই যে আমার সার্টিফিকেট । "
এর দুই বছর পর মা ইন্তেকাল করেন। সাভাবিক নিয়মে সার্টিফিকেট আসলে কি মা দেখে যেতে পারতেন?
======
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৭/৬/২০১৭